বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

মানবতার অকৃত্রিম বন্ধু রাসুলে করীম (স) এর হাতে গড়া একদল নিবেদিত প্রাণ সাহাবী ইসলামের সুমহান দাওয়াত নিয়ে সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটে এবং বহু ইসলাম প্রচারক বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ করেন। পরবর্তীতে ইসলাম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

হাতে লেখা পবিত্র কুরআন শরীফ

সপ্তদশ শতাব্দীতে অপূর্ব কারুকার্যে ও সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা কুরআন শরীফটি জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সে সময় ছাপাখানা না থাকলেও হাতে লিখেই মানুষ ধর্মীয় গ্রন্থ, বই-পুস্তক নিজস্ব সংগ্রহে রাখতো। কুরআনই হচ্ছে মানবতার একমাত্র মুক্তিসনদ। মুসলমানরা যতদিন কুরআনকে তাদের জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছিল ততদিন তারাই ছিল পৃথিবীর শাসক। বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ কুরআনভিত্তিক শাসন চালু করায় সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে কুরআন থেকে মুসলমানদের বিচ্যুতির ফলে মুসলিম জগতে নেমে আসে অমানিশা। অপমান, অধঃপতন আর নির্যাতন হয়েছে তাদের নিত্যসঙ্গী। মুসলমানদের রক্তে আজ পৃথিবী রঞ্জিত। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে কুরআনের দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

বাংলাদেশে ইসলামের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যে কয়জন ব্যক্তিত্বের অবদান চিরস্মরণীয় তন্মধ্যে হযরত শাহজালাল (র) অন্যতম। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ তার সেনাপতি সেকান্দার গাজীকে দু'বার রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠিয়ে ব্যর্থ হলে শাহজালাল (র) ৩৬০জন শিষ্য নিয়ে ঐ বাহিনীকে সহযোগিতা করলে যৌথ বাহিনীর অভিযানের মুখে গৌর গোবিন্দ পলায়নে বাধ্য হয়। সুদূর ইয়ামেনের দীপ্ত দরবেশ হযরত শাহজালাল (র) আজ থেকে ৭০০ বছর পূর্বে সিলেট বিজয় করে মহানবী (স) প্রতিষ্ঠিত মদিনার নগর রাষ্ট্রের অনুরূপ একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে (১৩০৩-৪৬খৃ) যে উন্নত সভ্যতার পত্তন করেছিলেন তার ভিত্তি ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। তারই স্মৃতিধন্য এই সিলেট বাংলাদেশের সম্পদ-সৌন্দর্য-সমৃদ্ধির প্রতীক। সুপ্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক এবং শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার গৌরবোজ্জল ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারে ধন্য সিলেট বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী।

মুসলিম শাসকদের প্রাসাদের প্রবেশ পথে এধরনের নহবতখানা থাকতো। এখান থেকে মুসাফিরদের আশ্রয়ের সন্ধান দেয়া হতো। সকাল-সন্ধ্যায় বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন ও ফরমান জারী করা হতো। এটিই বাংলাদেশে সন্ধানপ্রাপ্ত একমাত্র নহবতখানা।

শাহজালাল (র) এর মাযার সংলগ্ন মসজিদ

বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে ইসলামের আগমন

১২০৪খৃ বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেই এদেশের অধিবাসীগণ ইসলামের সাথে পরিচিত ছিলেন। আরবদেরকে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে চীনে যেতে হতো। এছাড়াও এ বন্দরের সাথে ইসলাম আগমনের পূর্বেই আরবদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল (সঃ) এর সময় ৬১৭খৃ সাহাবী আবু ওয়াক্কাস মালিক (রা) এর নেতৃত্বে কায়েস ইবনু ছায়রদী, তামীম আনসারী, উরওয়াহ ইবনু আছাছা, আবু কায়েস ইবনু হারিসা (রা) সহ একটি দল চট্টগ্রামে আসেন। এখানে ইসলাম প্রচার করে কয়েক বছর পর তারা চীনে যান। রাসূল (সা) এর ওফাতের পর যে সকল সাহাবী ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বীন প্রচার করতে এসে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছেছেন তারা হলেন • আব্দুল্লাহ ইবনু উতবান • আসেম ইবনু আমর তামিমী • সাহল ইবনুল আবদী • সুহায়েল ইবনু আদী • হাকিম ইবনু আবিল আস সাকাফী (রা)। পরবর্তীতে দু'জন তাবেয়ী মুহাম্মদ মামুন ও মুহাম্মদ মোহায়মেন এর একটি দলসহ এরূপ পাঁচটি দল বাংলা মুলুকে ইসলাম প্রচার করেন।

৭১২খৃ মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করলে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের পথ সুগম হয়। ৭৭৮খৃ বঙ্গোপসাগরে ঝড়ে কবলিত মুসলমানগণ আরাকানে আশ্রয় পায়। ৯৫১খৃ আরাকানের মুসলমানেরা পার্শ্ববর্তী Test ta-Gong (চাটিগাঁও/চট্টগ্রাম) নামক স্থান বিজয় করেন এবং বাংলায় ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। ১০৫৩খৃ শাহ মুহাম্মদ সুলতান বলখী নৌ-পথে ইসলাম প্রচারের জন্য মানিকগঞ্জের হরিরামনগর আসেন। পরবর্তীতে বগুড়ার মহাস্থানগড়কে কেন্দ্র করে নিকটবর্তী অঞ্চলে মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করেন। ১১০০খৃ একদল মুবাল্লিগ নিয়ে শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী নেত্রকোণায় আসেন। মদনপুরের রাজার নিকট ইসলামের দাওয়াত দিলে প্রথমে তিনি বিদ্বেষপোষণ করলেও পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ১১৭৯খৃ বাবা শাহ আদম একদল সঙ্গী নিয়ে বিক্রমপুরে ইসলাম প্রচার করেন। ১১৮৪খৃ শাহ মাখদূম রূপোশ রাজশাহী অঞ্চলের প্রথম ইসলাম প্রচারক। বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে যেসব ইসলাম প্রচারক সম্পূর্ণ বিরোধী পরিবেশে বাংলায় ইসলামের ভিত গড়ে তুলেছিলেন শাহ মাখদূম ছিলেন তাদের প্রধানতম। তিনি রামপুরের বোয়ালিয়াকে কেন্দ্র করে রাজশাহীকে ইসলামের দুর্গে পরিণত করেন।

বিভিন্ন অঞ্চলে বিজয়ীবেশে ইসলাম

উত্তরবঙ্গ (গৌড়, নদীয়া, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর) : ১২০৪খৃ বখতিয়ার খিলজী; পূর্বাঞ্চল (সোনারগাঁও, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ) : ১২৮০খৃ মুগিসউদ্দিন তুগরীল; সিলেট : ১৩০৩খৃ শাহজালাল, সেকান্দার গাজী; চট্টগ্রাম : ১৩৪০খৃ ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ; খুলনা বিভাগ : ১৪১৮-১৪৪৯খৃ খান জাহান আলী।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১২০৪খৃ। মুসলিম শাসন একাধারে ৫৫৪ বছর চলেছিল। তা হলো–

১২০৪খৃ লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। তিনি রাজমহল, মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, যশোর ও নদীয়ায় ইসলাম সম্প্রসারণের জন্য মসজিদ, ইসলামী শিক্ষালয় স্থাপন ও প্রচারক নিয়োগ করেন ১২১২-২৭খৃ হুসাম উদ্দিন খিলজী বহু মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। তিনি বিশিষ্ট আলেমদেরকে ভাতা প্রদান এবং দরবারে ওয়াজের ব্যবস্থা করতেন ১২৭৮খৃ শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ সোনারগাঁ এসে বসতি স্থাপন করে নির্ভেজাল জ্ঞান বিতরণের জন্য এখানে মাদ্রাসা স্থাপন করেন ১৩০১-০৩খৃ সুলতান ফিরোজ শাহের শাসনকালে শ্রীহট্টের মুসলিম নিপীড়ক রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে সেনাপতি সেকান্দার গাজীর নেতৃত্বে দু'বার ব্যর্থ অভিযানের পর হযরত শাহজালালের সহযোগিতায় হিন্দুরাজের পতন হয়। আব্দুল কাদির জিলানীর পৌত্র সাইয়েদ আহমদ তানুরী লক্ষ্মীপুরের কাঞ্চনপুরে ইসলাম প্রচার করেন। বখতিয়ার মাইসুর সন্দ্বীপে ইসলাম প্রচার করেন ১৩১৩খৃ শাহ শফীউদ্দীনের সহযোগিতায় জাফরখান সাতগাঁও জয় করেন ১৩২৫খৃ লখনৌতির গভর্ণর বাহরাম খানের সিলাহদার ফখরুদ্দীন ভুলুয়া (নোয়াখালী), চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম শাসন সম্প্রসারিত করেন ১৩৫২খৃ হাজী শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নিষ্ঠাবান মুসলিম হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করা ছাড়াও ইসলাম প্রচারে মুবাল্লিগদেরকে উৎসাহিত করতেন ১৪৩৯খৃ খান জাহান আলী বৃহত্তর খুলনায় ইসলাম প্রচার শুরু করেন। ষাটগম্বুজ মসজিদ তার অমরকীর্তি। তিনি বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষালয় স্থাপন করেন ১৪৫৯খৃ রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের শাসনামলে আরব দেশ থেকে শাহ ইসমাঈল গাজী ১২০জন মুবাল্লিগ নিয়ে গৌড়ে আসেন এবং সিলেট ও চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার করেন ১৪৭৫খৃ ইউসুফ শাহ তাঁর শাসনামলে ইসলামী বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করেন। জনসাধারণের নৈতিক মানোন্নয়নে মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন এবং বহু মসজিদ নির্মাণ করেন ১৫১৬খৃ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা আলাউদ্দীন শাহ পরাগল খান খলিফাতুল্লাহ, আল্লাহর পথের মুজাহিদ, ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হন ১৫৩৬খৃ সুলাইমান কররাণী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। তিনি সালতানাতে ইসলামী শরীয়াহ কার্যকর করেন এবং প্রতিদিন সকালবেলা একদল আলেমের সাথে শরীয়াহ বিষয়ক আলোচনা করতেন ১৫৮৩-১৫৯৯খৃ ঈশা খাঁ বার ভূঁইয়াদের নিয়ে বাতিল ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা মোঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই করে বাংলাকে দ্বীনেএলাহীর প্রভাবমুক্ত রাখেন এবং দিল্লী থেকে বিতাড়িত প্রতিবাদী মুসলমানদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত করেন ১৬৬৪খৃ সম্রাট আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি ঢাকায় এসে পৌঁছে

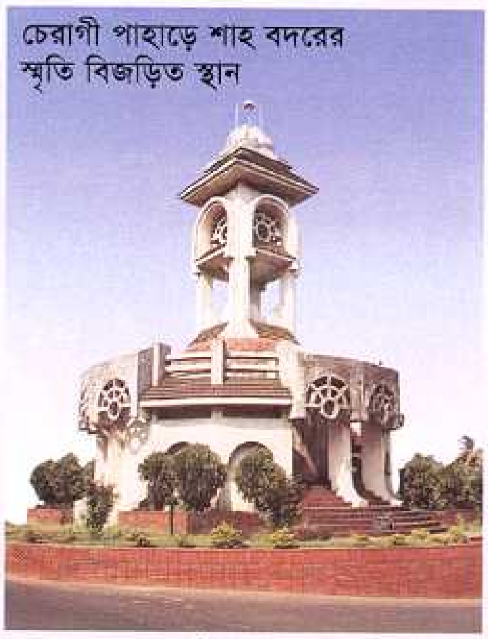

চেরাগী পাহাড়ে শাহ বদরের স্মৃতি বিজড়িত স্থান

শাহ বদর এখানে চাটি বা চেরাগ জ্বালিয়ে লোকালয় গড়ে তোলেন এবং ইসলাম প্রচার করেন। তাই এলাকার নাম হয় চাটিগাঁ বা চট্টগ্রাম। বার আওয়ালিয়ার পুণ্যভূমি চট্টগ্রামে পদধূলি পড়েছে অসংখ্য পুণ্যাত্মার। সেই রাসুল (স) এর যুগ থেকেই তার প্রিয় ৪জন সাহাবীসহ এখানে এসেছিলেন অসংখ্য মুসলিম ব্যবসায়ী ও ইসলাম প্রচারক। তারা ইসলাম প্রচার ও জনগণের কৃষ্টি-কালচার পরিবর্তন করেন। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু আগেই চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল, পার্শ্ববর্তী আরাকানসহ সমুদ্র উপকূলবর্তী বিভিন্ন বন্দর যেমন মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, চীন, থাইল্যান্ডে ইসলাম প্রচার হতে থাকে। গড়ে উঠে একটি মুসলিম নৌ-এলাকা। এ নৌ-পথেই চট্টগ্রাম হয়ে ইসলাম বাংলায় প্রথম প্রবেশ করে। এজন্যই চট্টগ্রামকে ইসলামের প্রবেশদ্বার বলা হয়।

ইংরেজ আমলে মুসলিম সংস্কারকদের ভূমিকা

১৭৫৭ সালে মুসলিম শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটলে বাংলার মুসলমানদের উপর ইংরেজ শাসন ও হিন্দু জমিদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মুসলমানরা তিনধরনের আক্রমণের শিকার হতে থাকে। দখলদার ইংরেজদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চরম আক্রমণ, তাদের তল্পিবাহক হিন্দু এলিটদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে খৃষ্টান মিশনারীদের ব্যাপক ধর্মান্তকরণের চেষ্টা। এই বহুমুখী আক্রমণ প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন মুসলিম সমাজ সংস্কারকগণ। তন্মধ্যে অন্যতম হলেন–

হাজী শরীয়তুল্লাহ ঃ তিনি মুসলিম সমাজ থেকে কুসংস্কার, শিরক, বেদায়াত নির্মূলের জন্য ১৮১৮খৃ ফরায়েজী আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে দুদু মিয়া মৃত্যু পর্যন্ত (১৮৪০-৬২খৃ) এটাকে ইংরেজ প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ দেন।

মীর নিসার আলী তিতুমীর ঃ তিনি ১৮২১ সালে ইংরেজ, হিন্দু জমিদার, নীলকরদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ ও মুসলিম সমাজে আত্মজাগরণ সৃষ্টিতে গড়ে তোলেন আন্দোলন। অত্যাচারী জমিদারদের দমন করে ইংরেজ পেটুয়াবাহিনীকে একাধিকবার পরাজিত করেন। তিনি ১৮৩১খৃ তার নারিকেল বাড়িয়ার বাঁশের কেল্লায় শাহাদাৎবরণ করেন।

মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী ঃ তিনি বাংলা আসামের আনাচে-কানাচে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেন। মুসলিম সমাজকে পরাধীনতার হীনমন্যতা ও হিন্দু সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা করেন। তিনি মুসলমানদেরকে আবার মুসলমান বানান। তখনকার মুসলিম সমাজ এতটা অধঃপাতে গিয়েছিল যে, পুরুষরা লেংটি ও মেয়েরা গামছা পরত এবং হিন্দু জমিদারদের দেয়া নবজাতকের নাম গেছু, গাছা, পেটা, ফেজু এ ধরনের গ্রহণ করত। মুসলমানরা হিন্দুদের সামাজিক অনুষ্ঠান সবই পালন করত। তিনি ১৮২২খৃ তার প্রচার কার্যক্রম শুরু করেন এবং ১৮৭৩খৃ রংপুরে মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত তা অব্যাহত রেখে মুসলিম সমাজের আমূল পরিবর্তন করেন।

মুন্সি মেহেরুল্লাহ ঃ খৃষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা রোধে তিনি অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখেন। তার চেষ্টার ফলেই মিশনারীদের কর্মতৎপরতা অনেক কমে যায় এবং মুসলিম সমাজ সতর্ক হতে পারে।

বিচ্ছিন্ন অঞ্চল হওয়ার পরও মুসলিম প্রধান বাংলাদেশ

বিশ্বমানচিত্রের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, এর চারপাশে নানা মতাবলম্বীদের আবাসভূমি হওয়ার পরও কিভাবে বিচ্ছিন্ন এ অঞ্চলটি মুসলিম প্রধানের গৌরব অর্জন করল, তার কারণ হলো : ইসলাম যখন সমগ্র দুনিয়ায় মুবাল্লিগ ও মুজাহিদগণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়েছিল তখন স্থলপথের চেয়ে নৌ-পথই ছিল যোগাযোগের সর্বোত্তম মাধ্যম। বাংলার চাটিগাঁও ছিল বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর একটি। ইসলাম প্রচারক ও আরব বণিকদের বাণিজ্য জাহাজ বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে শৎগঙ্গ (চট্টগ্রাম) বন্দর হয়ে চীন দেশে যেত। এ সুবাদে বাণিজ্য কাফেলা ও মুবাল্লিগগণ বাংলায় প্রবেশ করে ইসলামের দাওয়াত মানুষের হৃদয় রাজ্যে গেঁথে দেন। তাছাড়া রাজনৈতিক বলয়মুক্ত, শান্ত প্রকৃতি ও কোমল স্বভাবের অধিকারী, নৈতিক চরিত্রে খুবই উন্নত এ অঞ্চলের মানুষ ইসলামের দাওয়াত পেশ করার সাথে সাথে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিল। ফলে ইসলাম দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। পরবর্তীতে ইসলাম রাজনৈতিক তৎপরতার সমন্বয়ে বিজয়ী রূপ লাভ করে।

অঞ্চলভিত্তিক বিখ্যাত ইসলাম প্রচারকগণ

চট্টগ্রাম ৬১৭খৃ সাহাবী– আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাব, কায়েস ইবনু হুযাইফা, উরওয়াহ ইবনু আছাছা, আবু কায়েস ইবনুল হারিস (রা), ৬৪৬খৃ তাবেয়ী– মুহাম্মদ মামুন, মুহাম্মদ মুহায়মেন, ৮৭৪খৃ আওলিয়া– বায়েযীদ বোস্তামী, মাহমুদ মাহী সওয়ার, বদর শাহ, ১৫০৫খৃ শেখ ফরিদ, ১৮০১খৃ শাহ আমানত কুমিল্লা-চাঁদপুর ১৩০৩খৃ শাহ রাস্তি, শাহ মাদার খাঁ নেত্রকোণা ১১০০খৃ শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী মুন্সীগঞ্জ ১২০০খৃ আদম শাহ রাজশাহী ১১৮৪খৃ শাহ মাখদুম রূপোশ, ফুরকান শাহ বগুড়া ১৫৫৩ শাহ বন্দিগী গাজী, ১৬৫৮খৃ শাহ সুলতান বলখী, ১৭৭৬ ফতেহ আলী দিনাজপুর ১২০৩খৃ আলী মারদান খিলজী, বদরুদ্দীন পাবনা ১২৪০খৃ মাখদুম শাহ দৌলা সোনারগাঁও ১২৭৮খৃ শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ, ১৩১৩খৃ শাহ শফীউদ্দীন, ১৩৫২খৃ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, শায়খ শারফুদ্দীন ইয়াহিয়া, ১৩৫৮খৃ শায়খ আলাউল হক সিলেট ১৩০৩খৃ শাহজালাল ইয়ামেনী, শাহ পরাণ ১৪৫৯খৃ শাহ ইসমাঈল গাজী লক্ষ্মীপুর ১৩০৪খৃ সাইয়েদ আহমাদ তানুরী নোয়াখালী ১৩২৮খৃ ফখরুদ্দীন বাগের হাট ১৪৩৯খৃ খান জাহান আলী, গরীব শাহ, শাহ মাদার, ১৪৫৯খৃ মুহাম্মদ আবু তাহির ঢাকা বিভাগ ১০৫৩খৃ সুলতান রুমী, ১১৭৯খৃ আদম শহীদ, ১৪৯০খৃ তুরকান শাহ, ১৫৪৫খৃ সুলাইমান খান, ১৫৭৭খৃ শাহ আলী বোগদাদী, ১৫৮৪খৃ শাহবাজ খান, ১৬৫৯খৃ মুয়াযযাম খান মীর জুমলা, ১৬৬৪খৃ শায়েস্তা খাঁন জাহাঙ্গীর খুলনা ১২৭৭খৃ হযরত খান গাজী রংপুর ১৩০৩খৃ শাহ কলন্দর ১৩০৭খৃ মখদুম শাহ জালালুদ্দীন, জাহাঁগশাত বুখারী, ১৮৯৭খৃ সৈয়দ আবু জাফর মাদানী, গোরা সৈয়দ পীর, পাগলা পীর, ১৪৫৯খৃ শাহ ইসমাঈল গাজী, ১৮৭৩খৃ কেরামত আলী জৌনপুরী, শাহ ফলাদর ফরিদপুর ১০৪৭খৃ শাহ সুলতান বলখী, ১২০০খৃ শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তার, ১৪০০খৃ বদিউদ্দীন শাহ মাদার, ১৪১২খৃ শাহ আলী বাগদাদী, ১৮১৮খৃ হাজী শরিয়তুল্লাহ, ১৮৯৮খৃ শামসুল হক ফরিদপুরী জামালপুর ১৫০৩খৃ শাহ কামাল, ১৭৭৯খৃ শাহ জামাল বৃহত্তর বরিশাল ১৩৬১খৃ সাইয়েদুল আরেফীন, মীর কুতুব, চেরাগ আলম, নফিসুর রহমান, শাহ ওয়াজির আলী, শাহ ইয়ার, ১৯১৪খৃ নেছার উদ্দিন আহমদ, ১৮৫০খৃ কেরামত আলী, ১৮৫৭খৃ আবু জাফর ছালেহ।

ধানমন্ডি ঈদগাহ

বাংলাদেশের প্রাচীন ঈদগাহের একমাত্র নিদর্শন। বাংলার সুবাদার শাহ সুজার আমলে দেওয়ান মীর আবুল কাশেম ১৬৪০খৃ এটি নির্মাণ করেন। অন্যান্য বিখ্যাত ঈদগাহের মধ্যে প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ ঈদগাহ।

গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের কবর, সোনারগাঁ

এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বাংলার স্বাধীন শাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় শাসক গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ। তাঁর ন্যায়বিচার আজো কিংবদন্তি হয়ে আছে। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অমাত্য রাজা গণেশের চক্রান্তে ১৪১১খৃ নিহত হন।

শায়েস্তা খানের বাড়ি

১৬৬৩খৃ বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান তাঁর বসবাসের জন্য ছোটকাটরা বলে খ্যাত এই ইমারত নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে এর প্রাচীন সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এটি ঢাকার চকবাজারে অবস্থিত।

পানাম পুল

মুসলিম শাসনামল ছিল জনকল্যাণমুখী। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল তখন। সে সময় অসংখ্য রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-পুল নির্মাণ করা হয়। সোনারগাঁয়ে মোঘল আমলে নির্মিত পানাম জনপদের প্রবেশপথে ১৭৩ ফুট দীর্ঘ এ পুলটি তারই নজির।

দরসবাড়ি মাদ্রাসার ভূমি কাঠামো

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত প্রাচীন গৌড় নগরীতে ১৪৭৯খৃ এই বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নির্মিত হয়। পাশে একটি চমৎকার মসজিদ রয়েছে। আরবী দরস অর্থ পাঠদান। মাদ্রাসায় দরস বা পাঠদান করা থেকেই এলাকার নাম দরসবাড়ি হয়ে যায়।

ইদ্রাকপুর জলদুর্গ

১৬৬০খৃ বাংলার সুবাদার মীরজুমলা মগ জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মুন্সীগঞ্জের ইছামতি নদীর তীরে এ দুর্গ তৈরি করেন। বাংলাদেশে যতগুলো প্রাচীন দুর্গ দেখা যায় তন্মধ্যে জলদুর্গ হিসেবে ইদ্রাকপুর বিখ্যাত।

দুর্গের প্রবেশপথ

এটি নারায়ণগঞ্জের হাজিগঞ্জ দুর্গের প্রবেশ পথ। দুর্গের প্রবেশ পথ কৌশলগত কারণে বেশ উঁচু এবং সরু রাখা হতো। যাতে শত্রুবাহিনী সহজে ভিতরে ঢুকতে না পারে।

ষাটগম্বুজ মসজিদ

খুলনা বিভাগের সর্বত্র জনবসতি গড়ে তোলা এবং ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন খান জাহান আলী। তিনি এলাকায় কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে নাম দেন খলিফাতাবাদ বা আল্লাহর প্রতিনিধির অঞ্চল। বিখ্যাত ষাটগম্বুজ মসজিদসহ ৩৬০টি মসজিদ, লোনা পানির দেশে সুপেয় পানির জন্য ৩৬০টি দীঘি ও অসংখ্য পাকা সড়ক নির্মাণ করেন। তিনি ঝিনাইদহের বারবাজার থেকে দক্ষিণমুখে পথে পাকা সড়ক, পাকা মসজিদ নির্মাণ ও বড় বড় জলাশয় খনন করে অগ্রসর হতে হতে বাগেরহাটে এসে আস্তানা

তাহখান

জলাশয় সংলগ্ন ইমারত। এর ভূগর্ভস্থ ক
শীতল রাখতে জলাশয় হতে পাইপ দ্বারা
সরবরাহ করা হত। গৌড়ের এই তাহখা
১৬৫৫খৃ সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহসুজা
পীর শাহ্ নিয়ামতুল্লাহর জন্য নির্মাণ করেন।

শিলালিপি

ইতিহাস উদ্ধারে শিলালিপির ভূমিকা অপরিসীম। ইতিহাস ইসলামের দান। প্রায় সকল ইসলামী স্থাপত্যে শিলালিপি দেখা যায়। এসব শিলালিপিতে রয়েছে শৈল্পিক নিদর্শন। ১৫৮২ সালে স্থাপিত বগুড়া জেলার শেরপুরের খেরুয়া মসজিদ গাত্রে ধুসর বেলে পাথরের এ চমৎকার শিলালিপিটি সংরক্ষিত আছে।